খনা ও অন্যান্য

তীর্থঙ্কর | খনা | বাঁয়েন

সামিনা লুৎফা নিত্রা

খনা ও অন্যান্য
সামিনা লুৎফা নিত্রা

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০২২

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম বেইজমেন্ট
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
মোস্তাফিজ কারিগর

প্রচ্ছদে ব্যবহৃত আলোকচিত্র
মাহফুজুল ইসলাম রাহাত

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৪৮৩-৪৮৬ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট নীলক্ষেত ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে বুকস অফ বেঙ্গল বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং কলকাতা

মূল্য: ৩৫০ টাকা

Khona o Onnanyo by Samina Lutfa Nitra Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market Kantabon Dhaka 1205 First Published: September 2022
Phone: 02223368736 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bkash)
Price: 350 Taka RS: 350 US 12 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-96871-2-2

ঘরে বসে কবি প্রকাশনী'র যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

উ ৎ স র্গ

মোহাম্মদ আলী হায়দার
প্রাকৃত নৃ হায়দার

সূ চি প ত্র

ভূমিকা ৯
তীর্থঙ্কর ২১
খনা ৬৭
বাঁয়েন ১৩৭

ভূমিকা

আমার তিনটি নাটক একসঙ্গে প্রকাশিত হচ্ছে। এর ভূমিকা আমি কী লিখব ঠিক বুঝতে পারছি না। যা বলার তা তো নাটকেই বলা হয়ে গেছে। সম্প্রতি অন্যের লেখা একটি নাটকের ভূমিকা লিখতে প্রায় ব্যাপক নাকানিচুবানি খেয়ে যা লিখেছি তা লেখা শেষে মনে হলো, ভালোই তো লিখেছি। পরে অন্য আরেকটি বই হস্তগত হলো এবং সেটা পড়ার পর মনে হলো—হায়, হায়, কিচ্ছু ঠিকঠাক লেখা হয়নি! নতুন যা জানলাম তাতে আমার লেখা ভক্তি-গদগদ-ভূমিকাটা আমাকে পীড়া দিতে থাকল। অর্থাৎ, আজ সত্য যা কাল তা হতে পারে অসত্য! কী মুশকিল!

যা হোক, এ বইয়ের তিন নাটক রচনার কালসীমা প্রায় ১৩ বছর। *তীর্থঙ্কর* লেখা শুরু করেছিলাম ১৯৯৯ কী ২০০০ সালে। নাটকটা প্রথম মঞ্চায়িত হয় ২০০১ সালের ২৩ আগস্টে শাহবাগের পাবলিক লাইব্রেরির শওকত ওসমান স্মৃতি মিলনায়তনে। সুবচন নাট্য সংসদ প্রযোজিত এ নাটকের নির্দেশনা দিয়েছিলেন ফয়েজ জহির। নাটকটির ৭০-এর বেশি প্রদর্শনী করেছে সুবচন। প্রায় হারিয়ে যাওয়া প্রকাশক কিসসা-কাহিনী এ নাটকটি পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করে ২০০৮ সালে। আর *খনা* লেখা নিয়ে ভাবনার শুরু ২০০১ সালেই। কিন্তু নাটকটি লিখতে সময় লেগেছিল প্রায় ৮ বছর। ২০০৮-এ নাটক মঞ্চায়িত হয় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির পরীক্ষণ থিয়েটার হলে। সুবচন নাট্য সংসদ প্রযোজিত এ নাটকটির নির্দেশনা দিয়েছিলেন মোহাম্মদ আলী হায়দার। সুবচন নাটকটির ১০টির মতো প্রদর্শনী করে। পরে ২০১০ সালে নাটকটি প্রকাশিত হয় যুক্ত প্রকাশনী থেকে। *The Unforgettable Three* নামে অ্যাডর্ন প্রকাশনী ২০১১ সালে কবীর চৌধুরী অনূদিত তিনটি নাটক ইংরেজিতে প্রকাশ করেছিল যেটাতে খনার অনুবাদও অন্তর্ভুক্ত। আর ২০১০ সালে বটতলা নতুন করে *খনা* মঞ্চায়ন করে ঢাকার কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে। মোহাম্মদ আলী হায়দারের নির্দেশনায় নাটকটির ৭৭টি (... তারিখ প্রর্যন্ত) প্রদর্শনী করেছে বটতলা। এ সংকলনের সবশেষ নাটক *বাঁয়েন* একটি অমঞ্চায়িত পাণ্ডুলিপি—মহাশ্বেতা দেবীর 'বাঁয়েন' গল্পের নাট্যরূপ। ভারতীয় নির্দেশক উষা গাঙ্গুলির নির্দেশনায় নাটকটি মঞ্চায়িত করার পরিকল্পনা নিয়ে ২০১৩ সালে সারা যাকের এ কাজের দায়িত্বভার আমাকে দিয়েছিলেন। কাজটি করতে গিয়ে উষা গাঙ্গুলির সঙ্গে এক অনন্য সখ্য গড়ে ওঠে। থিয়েটারি নানান বাস্তবতায় নাটকটি মঞ্চায়িত না হলেও উষাদির সঙ্গে আমার সখ্য অটুট ছিল। তাঁর অসময়

প্রয়াণে সে সখীকে হারিয়েছি ঠিকই, কিন্তু স্মৃতিটুকু খুঁচিয়ে বের করে এনেছে সেই অমঞ্চায়িত পাণ্ডুলিপি। এই প্রথম *বাঁয়েন* প্রকাশিত হতে যাচ্ছে।

সোহরাব-রুস্তম থেকে *তীর্থঙ্কর* বা তারও আগের কথা

আমার কখনোই নাটক লেখার কথা ছিল না। ১৯৯৬ সালে আমি সুবচন নাট্য সংসদে গিয়েছিলাম অভিনয় করতে—তখন আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞানের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী। ১৯৯৭ নাগাদ সুবচন-এর *টুয়েলফথ নাইট* নাটক অনুবাদের সময় আমার দায়িত্ব ছিল শেকসপিয়রের ইংরেজির সহজ বাংলা খুঁজে বের করা—বাকি সাহিত্য ফলিয়েছিলেন আসাদুল ইসলাম। হঠাৎ দেখি অনুবাদক হিসেবে আমার নামও আছে আসাদুল ইসলামের পাশে। ব্যাপক কুণ্ঠিত হলেও সেকালে অভিনয়ের সুযোগ নিয়েই আমি বেশি উত্তেজিত ছিলাম। টিএসসির দেয়ালে পা ঝুলিয়ে আড্ডা দিতে দিতে বা সেন্ট্রাল লাইব্রেরির বারান্দায় টিফিন খেতে খেতে বা টিএসসির তিনতলার মহড়াকক্ষের মেঝেতে গড়াতে গড়াতে বা প্রভূত বিশেষ ধোঁয়া ওড়ানো শেষে নূরজাহান রোড লক্ষ্য করে তাজমহল রোডের হাঁটাবাবার মতো হাঁটতে হাঁটতে আমার আর আসাদুল ইসলামের ঢাবি কোরামের মধ্যে দ্বিধাহীনভাবে পুরো শরীর গলিয়ে তিন শয়তানের কাণ্ডারী হয়ে উঠেছিলেন মোহাম্মদ আলী হায়দার। পরবর্তী জমানায় তিনি আত্মবিশ্বাসী নির্দেশকরূপে ঢাকাই মঞ্চজগতে আবির্ভূত হয়েছিলেন যদিও পেশাজীবনে তিনি টেলিভিশন ব্যবস্থাপক এবং আসাদুল ইসলাম হয়েছেন নিজ গুণে কবি, নাট্যকার ও ব্যাংকার। তবে শুরুর সেই কুণ্ঠা আমাকে আজও সাহিত্যের উঠানে সহজ হতে দেয়নি। 'নিজের বলে পরিচয় দেবার মতো মৌলিক কিছু তো আপনি লেখেননি' ধরনের উষ্মার উত্তরে নিজের হার কুণ্ঠা বিনেই স্বীকার করতে পারি। তবু নাটক লেখার ঘরে কিছু শব্দ-বাক্য যোগ হয়ে দাঁড়ায় কিছু, তার থেকে নির্বাচিত তিনটি এখানে। তবে সবসময়ই দলের প্রয়োজনে আমার লেখা বলে নিজের নাট্যকার কর্তাসত্তার প্রকাশ আমার তেমন ঘটেনি বললেই চলে। কেবল তিনটি নাটক এর ব্যতিক্রম—একটি এ বইয়ে ঢুকল।

সোহরাব-রুস্তমকে নিয়ে নাটক কেন করব সে প্রশ্ন সামনে রেখেই ১৯৯৯-এর কোনো এক দুপুরে শ্রদ্ধেয় নাট্যজন মামুনুর রশীদের সঙ্গে এক আলাপে বসেছিলাম সেকালে কেন্দ্রীয় কারাগার বলে পরিচিত এলাকার ভেতরে কম্বলের কারখানার এক কক্ষে। ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের ভেতরের ওই কারখানায় তখন আমাদের যাতায়াত বেশ নিয়মিত—কারণ সুবচন-এর সভাপতি ওয়ারেসাত হোসেন বেলালের (বীরপ্রতীক) অফিস ছিল সেটা। সেই অফিসে চাকরি করতেন সুবচন-এর আরেক বন্ধু যিনি পরে গ্রুপ থিয়েটারের নেতা হয়েছেন স্বচেষ্টায়—সে সময় তাকে গিয়াস আহম্মেদ বলে চিনলেও আজ আহম্মেদ গিয়াস নামে তাকে লোকে বেশি চিনবে।

সেই কম্বলের কারখানায় বসে নীরব হোটেল থেকে আনানো ভাত-ভর্তা খাবার লোভেই বাসা থেকে আনা নুডলস ভর্তি টিফিনবক্স লাইব্রেরির কাউন্টারে জমা রেখে হাঁটা দিতাম জেলখানার দিকে। ততদিনে তিন শয়তানের একজন আসাদুল ইসলাম চাকরিতে ঢুকে আমাদের বেকারসঙ্গ ত্যাগ করেছে এবং সেই সুযোগে আমরা কোনো এক ফাঁকে সচরাচর দুজনের মধ্যে ঘটে এমন সঙ্গে ধরা দিয়ে ফেলেছি। সেই বিশেষ বৈঠক শেষে মামুনুর রশীদেরই অনুপ্রেরণায় সুবচন নাট্য সংসদ এক দুঃসাহসী সিদ্ধান্তে সোহরাব-রুস্তম অবলম্বনে নতুন নাটকের পাণ্ডুলিপি তৈরির দায়িত্ব অর্পণ করেছিল আমাকে—তখনও আমি এক নবীন সদস্য মাত্র, মাত্র বছর তিনেক কেটেছে তখন আমার থিয়েটারের উঠানে। তারপর দিন গড়িয়েছে, তরুণপ্রাণ নির্দেশক ফয়েজ জহিরের সাহসে সাহস মিলিয়ে সুবচন-এর নবীন-প্রবীণ অভিনেত্রীগণ দাঁড় করান *তীর্থঙ্কর* নাটকের কাঠামো। তাদের সকলের মনীষা, কল্পনা ও আবেগের রংকে শুধু শব্দের তুলিতে সাজানোর দায়িত্ব পালনের আন্তরিক প্রচেষ্টাটুকু ছিল আমার।

মনিরুদ্দিন ইউসুফ অনূদিত ও বাংলা একাডেমি প্রকাশিত *শাহনামা*র 'সোহরাব-রুস্তম' অংশ এ নাটকের মাধ্যম মাত্র, গন্তব্য নয়। উপাখ্যানের চরিত্রগুলোর লোভ-অহংকার, যুদ্ধবাজি, আর মানবিক বোধলুপ্তির কথাকে সমসাময়িকতার প্রতিচ্ছবি করে তোলার জন্যই তীর্থঙ্করদের চরিত্রের সৃষ্টি ও বিকাশ। এ চরিত্রগুলো আমার, যারা একটা খুব চেনা গল্পের কাপড়ের ঢালে-ফাঁকে বুনে চলেন অচেনা বিশ্লেষণের নকশি পাড়—ফাঁকে খেলে যায় মার্কসীয় বয়ানের জরিসুতার নড়ি। তীর্থঙ্কররা যাত্রী জীবন তীর্থের। অনন্ত জীবন স্রোতের বহতা ধারাই তাদের আরাধ্য। মানবতাই তাদের একমাত্র ধর্ম। তাই তাদের নির্লিপ্তিও অসীম।

নিরীক্ষাস্নাত এবং কৃতঋণ এ নাটকের পাণ্ডুলিপি হয়ে ওঠার জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার সম্ভাব্য দৈর্ঘ্যের কারণে সম্ভব না। তবে মনিরুদ্দিন ইউসুফ অনূদিত *শাহনামা*র ঋণ অনস্বীকার্য। এই ব্যাপক কাজ করার সাহস ও সুযোগ দেবার জন্য সুবচন নাট্য সংসদ-এর সকল সদস্য, নাটকের কুশীলব ও নির্দেশক পুনঃপুনঃ ধন্যবাদার্হ। পাণ্ডুলিপির সমস্ত সীমাবদ্ধতার দায় আমার! সেকালে থিয়েটারের উঠানে আমি ছিলাম শিশু, নাটকের বুননে তার ফেলে আসা প্রগলভতার ছাপ টের পাওয়া খুব অসম্ভব নয়। তবে এ নাটকের বিশিষ্টতা হলো এর দৃশ্যকল্প নির্মাণ ও সংলাপে সংযম। সদ্য সমাজবিজ্ঞানে স্নাতক গণ্ডি পেরোনো নিত্রার সমাজবিজ্ঞানের ক্লাসরুমে পড়া যাবতীয় তত্ত্ব ও তথ্য ঘেঁটে নিজের সবটুকু বুঝ ঠেসে ঢুকিয়েছিলাম যুদ্ধের সমাজতত্ত্ব বলার আশায় লেখা এ নাটকে। কাজেই বকা যে খেতে হবে আখেরে, সে কি আর অজানা ছিল? না থাকে কখনো!

নাটকের গল্পে দেখা যায় অন্তহীন যাত্রায় কয়েকজন মানুষ খুঁজে বেড়ায় একটি খঞ্জর। খঞ্জরটি খুলে দেয় গল্পের ঝাঁপি—জীবনের শুরু থেকে শুরু যে গল্প অনাদি

অনন্ত সনাতন মানবতা ভূলুণ্ঠিত হবার আলেখ্য। ইরানের যুদ্ধক্ষেত্রে পিতার হাতে পুত্রের হত হবার গল্প। খুব চেনা এ গল্পকে অচেনা পথে নিয়ে যায় চারজন মানুষ। তারা দেখে রুস্তম-তহমিনা-কায়কাউস-আফ্রাসিয়াব, এমনকি সোহরাব ক্ষমতার শীর্ষে পৌঁছেও বড় একা। সিংহাসন বা ক্ষমতার দৌড় এদের ঠেলে দেয় ধ্বংস আর মৃত্যুর উন্মাদনায়। উত্তর প্রজন্মকে হত্যার হোলিতে। সোহরাব-রুস্তম উপাখ্যানের পটভূমিকায় মানুষেরা অপরিসীম নৈর্ব্যক্তিকতায় উন্মোচন করে বিশ্বায়নে উন্মত্ত সভ্যতার অনন্ত শোণিত তৃষ্ণা। ধসে পড়া বুদ্ধমূর্তি আর নিশ্চিহ্নপ্রায় নৃগোষ্ঠীর অভিশাপ পিঠে নিয়ে ওরা চলে অন্তহীন পথ—ধ্বংসের লড়াইকে ধিকৃত করে গেয়ে ওঠে নিরন্ত জীবনের জয়গান। এ কারণেই অনেক ভাবনা ও ভণিতা শেষে, সকলের পছন্দের নাম রুস্তম-সোহরাব থেকে বদলে আমি এর নাম দিই *তীর্থঙ্কর*—কারণ মানুষ চরিত্রদের বলা কথা বা গল্পগুলোই আসলে আমাদের এবং সময়ের চুলচেরা বিশ্লেষণ, তাদের নৈর্ব্যক্তিকতা দিয়ে দেখতে পারলে হয়তো এ জগতের সমস্যাগুলো চেনা যেত ঠিকঠাক। অতীত আর বর্তমান একই অভিমুখে হাঁটা-পথেই পড়ে। অতীতের গল্পের মধ্যে যেমন থাকে বর্তমান শুরুর বীজ, তেমনি বর্তমান অতীতের প্রতিচ্ছবিও। আজ যা ঘটমান কাল তা হবে ইতিহাস।

খনা: ইতিহাস না কিংবদন্তি?

খনা লেখার প্রস্তুতির শুরু ২০০১ থেকে। এ নাটকটিতে আমার কর্তাসত্তা প্রবল, নিজের ইচ্ছা ও আনন্দে অনেক সময় নিয়ে এ নাটক লেখা হয়েছে। আজ পর্যন্ত খনার সঙ্গে আমার বেশ টানাপোড়েনের সম্পর্ক। মনে হয় 'তারে ধরি ধরি মনে করি, ধরতে গেলে' ধরা দেয় না। চরিত্রে অভিনয়ও করি বলে, খনাকে নিয়ে অনেক প্রশ্ন তৈরি হয়, ঐতিহাসিক চরিত্র না হওয়াতে সেসব প্রশ্নের উত্তর নিজেকেই যুক্তিসাপেক্ষে খুঁজে বের করতে হয়। নানা বই ঘাঁটাঘাঁটি আর পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনার বারাসাত, হাড়োয়া, বেড়াচাপা, জীবনপুরের পথে ঘুরে ঘুরে, চন্দ্রকেতু গড় হাতড়ে আমরা পেয়ে যাই খনা-মিহিরের ঢিবি। মনে হয় এ বাংলাতেই, আমাদের খুব কাছাকাছি খনার নাড়ির খবরের কিছু বুঝি হদিস মিলল। তবে মনে করিয়ে রাখি যে কিংবদন্তির চরিত্রই এমন যে, যে সমাজে এর জন্ম সে সমাজ এমন এমন পায়ের ছাপ এঁকে রাখে যে মনে হয় সত্যি ছিল ঘটনাটা, কেবল কিংবদন্তি নয়। আর খনাকে নিয়ে কিংবদন্তির কোনো অভাব নেই, নেই অভাব পরস্পরবিরোধী মতেরও। অতল সমুদ্র মন্থনে হাতে যা ঠেকে তা অমৃত কিনা সে সংশয়ের সীমানা মনের আড়াল হয় না। এতসব সংশয়ের মধ্য থেকে আমার পছন্দের খনার কোন চেহারাটা কেমন করে আমি খুঁজে নিয়েছিলাম সে গল্পটাই কেবল আমি বলতে পারি। তার আগে কিছু ঋণস্বীকার প্রয়োজন।

প্রথম ঋণ আমার মা-বাবার কাছে যারা সবসময় জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখিয়েছেন কৃষি ও খনাকে। ঋণ অগ্রজ নাট্যজন রামেন্দু মজুমদার, মামুনুর রশীদ এবং সেলিম

আল দীনের কাছে। ঋণ নাট্যবন্ধু ফয়েজ জহিরের কাছে—যিনি শিক্ষক ও সমালোচক, যিনি শুধু নাটকের শেষ অংশটুকু পড়ার জন্য পাড়ি দিয়েছিলেন অজানা দেশ যুক্তরাষ্ট্রের লম্বা পথ। নাটক লেখা শুরু করেছিলাম বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন আয়োজিত প্রথম নাট্যকার কর্মশালার শেষে—নিমকোর গেস্টরুমের বারান্দায়। রাত্রিব্যাপী আড্ডা শেষে সেহরির ডাকে আমরা নিমকোর ছাদ থেকে নেমে যেতাম ক্যান্টিন কর্মচারীদের সেহরিতে ভাগ বসাতে। এক রাতে তাদের বানানো বেশি মিষ্টি দুধ-চা খেয়ে রুমের দরজায় পৌঁছে দেখলাম রুমমেট সাধনা আহমেদ গভীর ঘুমে। অগত্যা বারান্দার মেঝে বসে পোকা-আকর্ষক আলোয় লিখলাম—জন্ম সত্য মৃত্যু জীবন লক্ষ্য পথ। কর্মশালার সকল শিক্ষক-সুহৃদ, আরও বহুজন, বহু লেখা, বহু তারা খসা, বঙ্গোপসাগরে গড়ানো বহু বছরের জল—ঋণী সকলের কাছে। আর অপরিসীম ঋণ সুবচন ও বটতলার বন্ধুদের কাছে যারা বারবার আস্থা রেখেছেন আমার দুরূহ ভাষার নাটকের ওপর। ঋণী নির্দেশক মোহাম্মদ আলী হায়দারের কাছে যিনি খনাকে দেখেছেন এমন রূপে যা অনন্যরূপে অন্যতর আমার দেখা থেকে। জয় হোক তার নাট্যসৃজন ছন্দের। এবার আসা যাক আসল কথায়!

খনা পরিচিত তার বচনের কারণে। কৃষি, আবহাওয়া, গৃহনির্মাণ থেকে শুরু করে চিকিৎসা পর্যন্ত খনার নামে চালু নানা বচন-প্রবচনগুলো কেবল বাংলায় নয়, ছড়িয়ে আছে বিহার, আসাম মায় উড়িষ্যা পর্যন্ত এমন দাবি অনেক চিন্তকের।

> আষাঢ় নবমী শুক্ল পখা, কীসের এত লেখাজোখা?
> যদি বর্ষে মুষল ধারে, মধ্য সমুদ্রে বগা চড়ে
> যদি বর্ষে রিমিঝিমি, শস্যের ভার না সহে মেদিনী
> যদি বর্ষে ছিটেফোঁটা, পর্বতে হয় মীনের ঘটা
> হেসে সূর্য বসেন পাটে, চাষার বলদ বিকোয় হাটে (খনার বচন)

খনা কোনো ঐতিহাসিক চরিত্র নন, তার উৎস বা জীবন খুঁজতে হবে তাকে নিয়ে চালু থাকা কিংবদন্তির মাঝে। হোপি নেটিভ আমেরিকান ইন্ডিয়ানদের কিংবদন্তির সংগ্রাহক ও লেখক এক্কহার্ট মালোটকি, মিথ, কিংবদন্তি, গাথা আরও নানান প্রকারের মৌখিক সাহিত্যিক ঐতিহ্যকে বলেছেন মৌখিক শিল্পকর্ম। খনার বচনগুলো এরকমের মৌখিক শিল্পকর্মেরই অংশ যার ঐতিহাসিক মূল্যের চাইতে সামাজিক ঐতিহাসিক মূল্যের অনুসন্ধানটাই শ্রেয়তর, যদিও সহজতর বলা যাবে না মোটেই। তবে বচন বা প্রবচনের মৌখিক শিল্প হবার চেয়েও বড় দায়িত্ব রয়েছে। আর তা হলো এদের উপযোগিতা। বচনের উপযোগিতা তার বাচিক বা আদ্য অর্থের ওপর নির্ভরশীল। প্রবাদের মতো বচন-প্রবচনের ভাব বা সাংকেতিকতা না থাকায় এদের মূল কাজ হলো কোনো একটি বিশেষ বিষয় সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করা বা জানানো। খনার বচনগুলোরও তেমনি কিছু কাজ রয়েছে যার মূল হিসেবে আমরা পাই কৃষি ও আবহাওয়াকে। উল্লিখিত বচনটিতে আমরা দেখতে পাই, কৃষি

ও আবহাওয়ার পারস্পরিক সম্পর্কের রূপ। তার মানে আষাঢ়ের শুক্লপক্ষের নবমী তিথিতে কেমন বৃষ্টি হলে, ফল ও ফসলের (মাছসহ) উৎপাদনে কী কী প্রভাব পড়বে সেটাই এ বচনে বিধৃত হয়েছে। আর বৃষ্টি একদম না হলে চাষার বলদটা পর্যন্ত হাটে বিকোবে। এ ধরনের কৃষিজ্ঞান কৃষকদের জন্য কত গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে তা অনুমেয়। তবে এ নিয়ে আরও আলোচনার আগে, পাঠকের সুবিধার জন্য *খনা* নাটকের গল্পটা বলে নিতে চাই।

বাংলার কৃষকের অন্যতম সুহৃদ খনা এক বিদূষী জ্যোতিষী, স্বামী মিহিরও একই বৃত্তিধারী। শ্বশুর যশস্বী জ্যোতিষী বরাহ মিহির। পুত্রজায়ার যশ, খ্যাতি ও বিদ্যার প্রভাব সন্দর্শনে বরাহের হীনম্মন্যতা ও ঈর্ষা। পুরুষের এই ঈর্ষাটুকু বোঝা ততটা কঠিন নয়। কঠিন থাকেওনি। খনা নারী, তার ঔদ্ধত্যের (পড়ুন সাফল্য) প্রতিকার হিসেবে শ্বশুরের নির্দেশে স্বামী মিহির তার জিভ কেটে নেন, এই নাটকীয়তাটুকুও তার গল্প বেঁচে থাকার একটা কারণ বলে আমি মনে করি। সমাজ তার কিংবদন্তি দিয়ে সামাজিকদের কিছু তো শেখাতে চায়। নারীকে শেখায় কী করে লক্ষ্মণ রেখার মধ্যে কাটাতে হয় জীবন, যে রেখা নারী নিজে আঁকেনি কোনোদিন, বরাবরই এঁকেছে পুরুষ। শ্বশুরের নির্দেশে লীলাবতীর জিহ্বা কর্তন ও তার খনা হয়ে ওঠার গল্প তাই পেরিয়েছে প্রজন্মের সীমানা। আবার এমনও হতে পারে যে প্রাথমিক গল্পটা চালু হবার সময় নারীকে বৃত্তাবদ্ধ করে ফেলাটা উদ্দেশ্য না থাকলেও পরবর্তীতে সমাজে নারীর অধস্তনতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এ উদ্দেশ্য গল্পটার টিকে থাকার ক্ষেত্রে সহায়তা করেছে। তাই একবিংশ শতকেও হাতড়ে বেড়ানো খনার বচন। তাকে নিয়ে যেমন গল্পের শেষ নেই, শেষ নেই ভিন্ন মতেরও। একেকজন একেক রকম স্থান, কালে স্থাপন করেন খনাকে। তাই আমরা জানতে চাই, কে খনা? তার নাম খনা কেন?

কারও মতে 'শুভক্ষণে' জন্ম তাই নাম খনা। আবার কেউ বলেন যে জিহ্বা কর্তিত বা খোনা থেকে খনা। আরেক নাম—লীলাবতী। কেউ বলেন, খনা লঙ্কাদ্বীপের ভাগ্যবিড়ম্বিত রাজকন্যা রাক্ষসের কবলে পড়ে পিতৃমাতৃহীন হয়ে দ্বীপবাসীর কাছে প্রতিপালিত। আবার কেউ বলেন, তিনি দ্বীপের রাজকন্যা, রাক্ষসের আক্রমণে অনাথ হওয়ায় লঙ্কার রাক্ষসেরাই তাঁকে লালনপালন করেন। আবার অন্য আরেক পণ্ডিতের মতে রাজতরঙ্গিনীতে বলা আছে 'বংগ-রাক্ষসৈঃ'। অর্থাৎ, বাংলাদেশকেও রাক্ষসের দেশ আখ্যা দেয়া হয়েছিল। ফলে খনা বঙ্গীয় কোনো দ্বীপবাসীনিও হতে পারেন। আরেক পণ্ডিতের মতে, খনার জন্ম পূর্ববঙ্গে। আসলে এরকম নানান জন্মবৃত্তান্ত থাকাটা কিন্তু খুব অস্বাভাবিক নয়। খনাকে নিয়ে লিখিত কোনো ইতিহাস থাকার সুযোগ না হওয়ায় তিনি যে কোথা থেকে এসে কোথায় ভেসেছেন তা নিয়ে প্রশ্নসহই আমরা তাকে পাঠ করি।

খনার কিংবদন্তি কোন রাজসভার তা নিয়েও আছে নানা মত। কেউ বলেন, বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় বরাহ মিহির নামে যে জ্যোতিষী ছিলেন তারই পুত্রবধূ খনা। আবার কেউ বলেন, খনা এসেছেন বাংলারই কোনো অঞ্চল থেকে তারপর গিয়েছেন উজ্জয়িনীতে বিক্রমাদিত্যের সভায়। কিন্তু চব্বিশ পরগনার হাড়োয়াতে খনা মিহিরের ঢিবি তো স্বচক্ষে দেখেছি। হাড়োয়ার বেড়াচাপা গ্রামে চন্দ্রকেতুর গড়ের সামনেই সেই ঢিবি। তাহলে খনা কোথায় ছিলেন, উজ্জয়িনীতে নাকি বাংলায়? রাজা চন্দ্রকেতুর পূর্বপুরুষ ধর্মকেতু ছিলেন দেউলনগরের রাজা। দেউলনগরের আদি নাম ছিল কেতু গ্রাম। ইছামতি আর ভাগিরথীবিধৌত এ প্রাচীন ভূমি গংগারিদই বা গঙ্গাঋদ্ধি নামে পরিচিত। সেই অঞ্চলে প্রাকৃত-অনার্য কৃষককুল অধ্যুষিত বালহন্ডার দেউলনগর, বেড়াচাপা, জীবনপুর, দেগঙ্গা, পৃথিবীগুনা, ঝিকরা, হাড়োয়া এমন সব জনপদজুড়ে ছিল নাটকের রাজা ধর্মকেতুর শাসন। যেহেতু স্বচক্ষে দেখা বেড়াচাপার ঢিবি তাই নাটকটিকে স্থাপন করেছি বাংলায়। সেকালে সমুদ্র বুঝিবা খুব দূরে ছিল না যার প্রমাণ বচনের ছত্রে ছত্রে আছে।

নাটকে দেখি সেই দেউলনগরের রাজা ধর্মকেতুর রাজজ্যোতিষী বরাহ মিহির। অদ্বিতীয় জ্যোতিষী, যিনি নমস্য কালে কালে। লঙ্কাদ্বীপ বা পূর্ববঙ্গের কোনো দ্বীপ থেকে খনা তাঁর স্বামী মিহিরকে সঙ্গে করে পৌঁছে দেন মিহিরের পিতা বরাহ মিহিরের কাছে। বরাহ পুত্র মিহিরের জন্মের সময় হারান প্রাণপ্রিয় স্ত্রীকে, যার জন্য পুত্রের দুর্ভাগ্যকেই দায়ী করেন তিনি। মিহিরের জন্মকোষ্ঠী ভুল গণনা করে বরাহ মনে করেন এ শিশু আনবে ধ্বংস, বিনাশ, অন্ধকার। তাই শিশু মিহিরকে একটি তাম্রপাত্রে করে ভাসিয়ে দেন তিনি বিদ্যাধরীর জলে। বহু বছর পর সেই মিহিরকে নিয়ে খনা হাজির হন বরাহের সামনে, ভুল প্রমাণ করেন বরাহের গণনা। ধর্মকেতুর রাজসভায় পরিচিত হন মিহির ও লীলাবতী। দ্রুতই রাজসভাসদ পদও লাভ করেন। বরাহ মেনে নিতে পারেন না পুত্রবধূর সাফল্য। ঈর্ষাকাতর বরাহ পুত্রকে আদেশ করেন খনার জিহ্বা কর্তন করে তাঁকে উৎসর্গ করতে।

যদি খনা লঙ্কাদ্বীপ থেকে এসে থাকেন উজ্জয়িনী কি বেড়াচাপায় তাহলে তিনি এ অঞ্চলের মাটি আর ফসলের গূঢ় কথা জানলেন কী করে, সেটাও তো একটা প্রশ্ন। যদিও বেশিরভাগ লোকেই মনে করে যে খনার বচনে বিধৃত জ্ঞান খনার। কিন্তু যুক্তি বলে খনা তার কালে বিখ্যাত জ্যোতিষী ছিলেন হয়তো তবে তার পক্ষে অজানা হবার কথা বাংলা বা উজ্জয়িনীর ফুল-ফসল-লতার জ্ঞান। ফলে বেগুনখেত বা কলাবাগানের পাতা আর শেকড়ের বর্ণ, গন্ধ, পরিচয় জানতে তিনি নিশ্চয়ই মিশেছেন চাষাদের সঙ্গে, শিখেছেন তাদের থেকেই। কার্পাস কী কোষ্টা কী রাই বা ষালী ধানের পত্র-পুষ্প-ফলের ঘ্রাণ শুঁকে শুঁকে চিনেছেন চাষানির গানে আর সুরে। তবে আরেকভাবেও ভাবা যায় যে খনা আসলে বাংলারই এক সাধারণ

কিষানি। যে কিষানি তার কালের কৃষিজ্ঞান কাণ্ডকে পদ বা বচন আকারে গেঁথেছেন। কিন্তু পুরুষ-পৃথিবী আর রাজতন্ত্রে নাভিশ্বাস তোলা অন্ধকারে ব্রাত্যজনের এ কাব্য টিকবে না ভেবে সমাজ তার সঙ্গে জড়িয়েছে রাজকন্যার তকমা আর শ্বশুরের সঙ্গে দ্বন্দ্বের নাটকীয়তা। তবে এ বচন যদি হয় কৃষকের আপন জ্ঞানকোষ সে জ্ঞান কিন্তু মানুষের, জনপদের। মাটির-জলের-ফসলের। এ কারণেই হারায়নি এ জ্ঞান, টিকেছে কালের সীমানা ছাড়িয়ে। তাই খনার বচন হলো প্রাকৃত কৃষক নারীর কণ্ঠস্বর, যে নারী উদ্যানভিত্তিক ব্যবস্থায় কৃষির গোড়াপত্তনকারী।

আর খনার সময়কাল নিয়ে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সূত্র বলে যে, যে কালের চাষারা এই বাংলায় ফলাচ্ছে কার্পাস, কাউন, চিনা, বেগুন, কলা, পাট আর হরেক পদের ধান সেকালে খনা ছিলেন। তখনও বাংলা একক ভাষারূপে হয়নি প্রাণিত। সংস্কৃত নিশ্চয়ই অজানা ছিল না খনার। লেখ্য বাংলার কোনো চলই হয়তো ছিল না। ছিল হয়তো অপভ্রংশ, প্রাকৃত মাগধীর মিশেল। ফলে তাদের প্রয়োজন হয়েছিল বচনগুলোর। যাতে করে তাদের বহু যুগের সঞ্চিত ফসলের জ্ঞান প্রজন্মান্তরে ছড়িয়ে যেতে পারে। তার মানে খনা ছিলেন চর্যাপদেরও আগে। গুপ্ত যুগের শেষ ভাগে হয়তো। তার মানে প্রায় চৌদ্দ কি পনেরোশ বছর আগের কথা। বাংলায় শুধু নয়, পৃথিবীর দেশে দেশে এমতো বচনগুচ্ছ লেখ্যভাষাহীনতার কালে অনেক কৃষিসমাজই জন্ম দিয়েছে।

সামাজিক বিবর্তনের ইতিহাসকে আমরা মানুষের নানাবিধ প্রযুক্তি আবিষ্কারের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে পারি। অর্থাৎ মানুষের আবিষ্কৃত প্রযুক্তি যত জটিল রূপ নিয়েছে, তার প্রযুক্তি চালাতে ব্যবহৃত শক্তির উৎস যত উন্নত হয়েছে তার সমাজে কাজের গতি বেড়েছে, শ্রমবিভাজন বেড়ে সমাজ ক্রমশ জটিলতর হয়েছে। আজকের উত্তর-শিল্পায়িত সমাজে পৌঁছানোর আগে মানবসমাজকে পার হতে হয়েছে শিকারি ও সংগ্রাহক সমাজ, পশুপালক ও উদ্যানভিত্তিক সমাজ, কৃষিসমাজ ও শিল্পায়িত সমাজ। একেক সমাজে উৎপাদন সম্পর্কের ভিন্নতা ছিল, ছিল ভিন্ন শ্রমবিভাজন, ভিন্ন উৎপাদনশক্তি (fuel)। শিকারি ও সংগ্রাহক সমাজ এবং পশুপালক ও উদ্যানভিত্তিক সমাজে নারী-পুরুষের শ্রমবিভাজনের উপস্থিতি কম দেখা যায়। যে সময়টাতে খনার বচনগুলোর প্রাদুর্ভাব বেশি দেখা গিয়েছে বাংলায় সে সময়টাতে বাংলার কৃষিতে ঘটছিল বিরাট বিপ্লব। বংশপরম্পরায় চলে আসা উদ্যানভিত্তিক সমাজ থেকে কৃষিসমাজে পদার্পণের শুরুর সময় সেটা। আহৃত নতুন জ্ঞান যা কৃষক শিখছিল তার মাঠ বা ফসলের খেত থেকে তা তার পরবর্তী প্রজন্মের কৃষকের কাজে লাগানোর জন্যই নবলব্ধ জ্ঞান সহজে প্রচারযোগ্য হওয়াটা জরুরি ছিল। লেখ্যভাষাহীনতার কালে তাই ছন্দে বাঁধা বচনগুলোই বাংলার ফুল-ফসল-লতার জ্ঞানকে পৌঁছে দিয়েছে প্রজন্মান্তরে। যেমন: